ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, February, 2026, Page No. 71- 78
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.272

সূর্য-দীঘল বাড়ি একটি আখ্যানের বিনির্মাণ

রঞ্জিত সরকার, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, বাংলা বিভাগ সামসি কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 24.12.2025; Accepted: 25.02.2026; Available online: 28.02.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Surya Dighal Bari is a novel written by the renowned fiction writer of East Bengal, Abu Ishaq. Set against the backdrop of the Partition of India, famine, and communal riots, the novel vividly portrays how these historical realities emerged as curses in the lives of ordinary people.

Alongside this, the author shows how, under the pressure of social authority, Muslim women are compelled to live lives of terror behind the veil, and how these rigid codes are eventually challenged and broken—particularly through the character of Joygun. The novel highlights how women struggle for their existence and self-respect, and also draws attention to the terrifying consequences of child marriage within Islamic society.

Behind the façade of a seemingly folktale-like narrative, the novel realistically depicts how figures like Gadu Pradhan carry out social exploitation. Furthermore, the story illustrates how the young boy Hasu is broken by the daily struggle for survival, yet simultaneously reshapes and rebuilds himself. All these aspects are explored through an analytical discussion of the novel's narrative structure.

Keywords: Partition, Famine, Communal Violence, Women's Oppression, Struggle for survival

'সূর্য দীঘল বাড়ি' শুধু একটি উপন্যাস নই, জীবন-যুদ্ধের আখ্যান। আর এই আখ্যানের বিনির্মাণ-নির্মাণের সাক্ষী স্বয়ং উপন্যাসিক আবু ইসহাক। উপন্যাসটি ১৯টি পরিচ্ছেদে বা অধ্যায়ে বিভক্ত। এই উপন্যাসে এক দিকে যেমন দেখানো হয়েছে শহর কেন্দ্রিক নাগরিক সভ্যতা, তেমনি দেখানো হয়েছে গ্রামীণ সভ্যতা। তাই উপন্যাসের শুরুর অংশেই উপন্যাসিক দেখালেন শহর থেকে তারা গ্রামে প্রবেশ করছে। লেখকের ভাষায়-

> "আবার তারা গ্রামে ফিরে আসে। পেছনে রেখে আসে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, মা-বাপ, ভাই-বোন। ভাতের লড়াইয়ে তারা হেরে গেল।"[১]

একদিকে যারা শহর কেন্দ্রিক জীবনে আশার আলো দেখেছিল, তারাই আজ নিঃস্ব হয়ে নতুন জীবনের স্বপ্ন নিয়ে গ্রামের বাস্তভিটা আঁকড়ে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই প্রতাপ নামক ব্যাক্তির নিকট যারা শোষিত তাদের জীবন রূপকথার আড়ালে অন্য এক ইঙ্গিত দেয়, তার সাক্ষী এই উপন্যাস। আর এই উপন্যাসের এরকম চরিত্র সমাজ থেকে বঞ্চিত যারা, তাদেরকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের আখ্যানের বিশ্ববিক্ষা।

উপন্যাসের প্লট বা বৃত্তকে কেন্দ্র করে যারা আবর্তিত বা বিবর্তিত তারা হলেন- জয়গুণ, জব্বার মুন্সী, শফির মা, করিম বকস, ফকির জবেদ আলী, গ্রামের মাতব্বর গদু প্রধান, গেদির মা, লালুর মা, খুর্সিদ মোল্লা (ফুড কমিটির সেক্রেটারি) রশিদ, মেহেরণ, ফাতিমা, আঞ্জমান, হাসু, কাসু ও মায়মুন।

জয়গুণ এর প্রথম স্বামী- জব্বার মুন্সী (মৃত্যু) দ্বিতীয় স্বামী- করিম বকস (তালাক) উভয়ের সন্তান- হাসু, কাসু ও মেয়ে মায়মুন। করিম বকস এর প্রথম স্ত্রী- মেহেরণ (আত্মহত্যা)। দ্বিতীয়স্ত্রী- জয়গুণ (তালাক)। দুর্ভিক্ষের অজুহাতে। ফাতিমা বা আঞ্জমান পুরুষ নামক প্রতাপের নিকট অসহায়।

জয়গুনের সঙ্গী- গেদির মা, লালুর মা। (ট্রেনে করে সস্তায় চাল কিনে বিক্রি করা)। শফির মা ভিক্ষা করে দিন যাপন করে। উভয়ের বাস সেই সূর্য দীঘল বাড়িতে। নৌকা করে মাছ ধরে হারুন ও করিম বকস। মায়মুন এর বিয়ে হয় ওসমান এর সাথে। এছাড়াও উপন্যাসে উল্লেখিত হাতেম ও খাদেম দুই ভাই।

এই উপন্যাসে একদিকে যেমন রয়েছে রূপকথার অন্তরালে প্রান্তিক স্বর, অন্যদিকে পঞ্চাশের আকাল, দেশ ভাগের পর বিপর্যয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, তালাক প্রসঙ্গ, নারীর প্রতি সামাজিক অভিশাপ ইত্যাদি ইত্যাদি। যেহেতু উপন্যাসটি লেখাই হয়েছিল ১৯৪৬-৪৭ এর প্রেক্ষাপট এবং দেশ ভাগের পর সাধারণ মানুষের ওপর সামাজিক অভিশাপ কিভাবে আঘাত হেনেছিল তারই ইতিবৃত্ত।

যেহেতু উপন্যাসটির প্রকাশ সাল ১৯৫৫। তাই এই উপন্যাসে দুই বঙ্গের ছায়া সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। 'ছায়া' শব্দটি এই কারনেই এখানে উল্লেখ করলাম যে অস্তিত্বর সংগ্রাম, স্বাধীনতার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য যে জাতি এক সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল, কিন্তু কিছু স্বার্থান্বেষী, ক্ষমতালোভী ব্যক্তির জন্যই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা সৃষ্টি করে দেশবিভক্ত হতে বাধ্য হয়। সেই ব্যক্তির নামও উল্লেখ করেছেন, গান্ধী বা জিন্নার মতো ব্যক্তিদের কথা সাহিত্যিক। দাঙ্গায় অসংখ্য নিরীহ মানুষের প্রাণ বেঘোরে চলে যায়। সেই স্মৃতিই এখন লেখকের কাছে ছায়া। যাদের যন্ত্রনা এখনও লেখককে বিদ্ধ করে। আর এরকম এক অসহায় নারীর বীরত্বসংগ্রাম, অস্তিত্বের লড়াই ধর্মের খোলস উপড়ে ফেলে মানবতার লড়াইয়ে সামিল হলেন তিনি আর কেউ নন, জয়গুণ নামক চরিত্র সৃষ্টি করে সমকালীন উপন্যাসের জগতে জেহাদ ঘোষণা করেন। একদিকে মৌলবি শাসনতন্ত্র অন্যদিকে বাঁচার লড়াই এই দুইয়ের মধ্যে তিনি নিজেকে মুক্ত মননে ভাসিয়ে দিলেন। ভেঙ্গে দিলেন সেই প্রথাকে। লেখকের ভাষায়-

> "জয়গুণ বাধ্য হয়েই ঘরের বার হয়েছে আজকে অনেক দিন। সে বাড়ী ঘর লেপে, ধান ভানে, চিড়া কোটে। সস্তায় চাল কিনতে যায় উত্তরে।...তাদের নিষেধ মেনে চললে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে, সে জানে।"[২]

অর্থাৎ সে নিয়মতান্ত্রিক ঘেরাটোপে তিল তিল করে মরতে চাইনি। তাই সে সিদ্ধান্ত নেই- "খাইটা খ্যামু।" অথচ সে স্বামীর নিকট শুনেছে, এগুলো করলে পাপ হবে। তাও রাস্তায় পুরুষদের সাথে বেপর্দা হয়ে হেঁটে বেড়ায়। সে জানে দোজখের শাস্তির বিবরণ। তা স্বত্বেও এ সমস্ত বিধানকে আড়াল করে বাঁচার তাগিদে মুক্ত বাতাসে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়। প্রথম স্বামী জব্বার মুন্সীর মৃত্যুর পর জয়গুণ তার মান ইজ্জতের ভার তুলে দিয়েছিল করিম বকশের ওপর। কিন্তু দুই বছর পর দুর্ভিক্ষের কারণ দেখিয়ে জয়গুণকে করিম বকশ তালাক দেয়। যা জয়গুণের নিকট ছিল জীবনের দ্বিতীয় বড় ধাক্কা। সেই সময় তার সন্তান ছিল হাসু, কাসু এবং মেয়ে মায়মুন ও কোলের একটি সন্তান। কিন্তু কোলের সন্তানটি অভাবের তাড়নায় সেই বছর মারা যায়। করিম বকশ কাসুকে রেখে জয়গুণকে তাড়িয়ে দেয়। কারণ করিম বকশ এর ধারণা-

> "পুত্র সে হাতের লাঠি বংশের চেরাগ। / কন্যা সে মাথার বোঝা কুলে দেয় দাগ।"[৩]

সমাজের এই নীতি আদর্শ মেনে তিন বছরের ছেলে কাসু থেকে যায় করিম বকশের কাছে। এক্ষেত্রে উপন্যাসিক চমৎকার ভাবে সেই গ্রামীণ লোককথা ব্যবহার করলেন তার এই উপন্যাসে। এই লোককথার মধ্যদিয়েই প্রমাণ হয় যে করিম বকশ নিজেই যেন একটা রাষ্ট্রতন্ত্র শাসকে রূপান্তরিত।কারণ তিনি যেভাবে মেহেরন, জয়গুন, ফাতিমা বা আঞ্জমানকে নিজের নিয়ন্ত্রনে বশ করে রাখতে চেয়েছেন; সেক্ষেত্রে করিম বকশ সফল হয়েছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম জয়গুণ। তাকে দুর্ভিক্ষ বা অভাবের তাড়না দেখিয়ে 'তালাক' একটা কৌশল। তাই তার বর্তমানে বা অবর্তমানে সেই ধারা কাসু বজায় রাখুক। আর এই কারনেই মায়মুনকে জয়গুণের নিকট ছেড়ে দেয়। আর এভাবেই সমাজের আধিপত্যতা কায়েম রাখার প্রতিযোগিতায় ভূমিকা পালন করেছে- গদু প্রধান, মৌলবি, খুরশিদ মোল্লা, রশিদ, সলেমান এর মতো প্রতাপশালী ব্যক্তিরা। দেশভাগ হলেও সেই হতভাগা মানুষের ভাগ্যর কোন পরিবর্তন হয়নি। তাই জয়গুণের আক্ষেপ অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই ভুলিয়ে দিয়েছে- "ধর্মের অনুশাসন।"[৪] লেখকের ভাষায়-

> "জীবন ধারণের কাছে ধর্মের বারণ তুচ্ছ হয়ে যায়, মিথ্যে হয়ে যায় তার কাছে।"[৫] (৩য় অধ্যায়)

জয়গুণের একদিকে অস্তিত্বের লড়াই অন্যদিকে সামাজিক অপশাসন বা আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা। এই দুই সমন্বয় তার ব্যক্তিসত্তার নিকট কতটা চ্যালেঞ্জ ছিল, তা এ উপন্যাসের আখ্যান প্রমাণ করে। এরই মধ্যে শফির মা বার্তা নিয়ে আসে ওসমানের সাথে মায়মুনের বিয়ের প্রস্তাব। ওসমানের আগের বৌ মারা যাওয়ার পর তার বাবা মায়মুনের সাথে বিয়ে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু জয়গুণ এখনই মেয়ে মায়মুনের বিয়ে দিতে আগ্রহী নয়, মায়ের কাছে মায়মুন এখনও ছোট বাচ্চা। সামাজিক চাপের নিকট নতি স্বীকার করে মায়মুনের বিয়ে দেই কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাকে শ্বশুর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে কাসুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় একপ্রকার বাধ্য হয়ে করিম বকশের বাড়িতে যায় এবং অসুস্থ কাসুকে চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের ব্যবস্থা করেন। ডাক্তারের চিকিৎসায় কাসু সাড়া দেয় ও সুস্থ হয়ে ওঠে। করিম জয়গুণকে পুনরায় ফিরে পেতে চাইলেও তাতে জয়গুণ সাড়া দেয়নি। কারণ জয়গুণ চাইনি আর কোন নারী যেন তার মত জীবন অতিবাহিত না করুক। এখানেই জয়গুণের মানবিক হৃদয়-সত্তা বড় হয়ে ওঠে। জয়গুণ ভালো করেই জানে মেহেরন কেন আত্মহত্যা করেছিল? কিংবা ফাতিমা বা আঞ্জমন এর জীবন কিভাবে অতিবাহিত। ইত্যকার সকল প্রশ্ন জয়গুণকে বার বার তাড়িত করে। সেই কারণেই জয়গুণ নিজ গৃহে ফিরে এসেছে।কিন্তু করিম বকশও পিছুটান হয়ে কাসুকে দেখার কৌশলে জয়গুণের দ্বারে উপস্থিত ।মেয়ে মায়মুন বসার জন্য পিঁড়ি দিলেও করিমের হাত শরীর কাঁপতে থাকে। সেই দৃশ্য জয়গুণের নজর এড়িয়ে যাইনি। সেই সূর্য দীঘল বাড়ীর চক্রান্ত যে গদু প্রধান সেই রহস্য উদ্ঘাটন করে করিম বকশ নিজের প্রাণ দিয়ে।

সমগ্র উপন্যাসের আখ্যানভাগ জুড়ে রয়েছে সূর্য দীঘল বাড়ীর রহস্য। আর এই বাড়িতেই সর্বস্ব হারিয়ে শফির মা ও জয়গুণ এর বসবাস। যে বাড়ীকে কেন্দ্র করে সূর্য ওঠে এবং অস্ত যায় তার নাম 'সূর্য দীঘল বাড়ী'। অর্থাৎ লেখকের ভাষায়- পূর্ব ও পশ্চিম প্রসারী বাড়ীর নাম। তাই সূর্য দীঘল বাড়ি। বাড়িটির পূর্ব ইতিহাস রয়েছে, এই ভিটায় হাতেম ও খাদেম নামক দুই ভাই থাকত। একদিন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তাদের দুই সন্তান জলে ডুবে মৃত্যু হয়। সেই থেকেই এই বাড়ীর রহস্য কারও অজানা নয়। আর এই বাড়িতেই থাকতে এসেছে জয়গুণরা। সেই ভিটায় রয়েছে পুরন একটি তাল গাছ। ফকির জবেদ আলির তন্ত্র-মন্ত্র সাধনায় জয়গুণদের বেশ কয়েক বছর নিশ্চিন্তে থাকার বসবাস হয়ে উঠেছে। ফকির জবেদ আলির শ্যেন দৃষ্টি জয়গুণের নজর এড়িয়ে যাইনি। একদিকে গদু প্রধান জয়গুণকে হাসিল করার নানান ফন্দি কৌশল করেই চলেছে। তা স্বত্বেও জয়গুণ নিজ সিদ্ধান্তে অটল থেকেছে। অভাবের তাড়নায় সন্তানদের দুমুঠো অন্ন

সংস্থানের জন্য জয়গুণকে ট্রেনে করে সস্তায় চাল কেনার জন্য উত্তরে যেতে হয় এবং ট্রেনে শুনতে পায় দেশ স্বাধীন হবে। জয়গুণের মনে হয় দেশ স্বাধীন হলে চাল সস্তা হবে। মায়ের দারিদ্রতার লড়াই দেখে হাসুও নিজেকে মোট বহন করার কাজে যুক্ত হয়। হাসুর ব্যক্তিত্বে লক্ষ্য করা যায় ভাইয়ের প্রতি স্নেহ ও সততা। আর এই দুর্বলতার সুযোগে রশিদ কন্ট্রাক্টর তাকে স্বল্প মুল্যে বেশি পরিশ্রম করিয়েছে।দেশ স্বাধীন হল পূর্ব পাকিস্থানের পতাকা আসমানি শহর থেকে গ্রামে পতপত করে উড়ছে। হাসুও সেই আসমানি পতাকা লাগিয়ে দেয়। কিন্তু জয়গুণের মতো স্বপ্ন ছিল;সলেমান খাঁ, লোকমানের মতো ব্যক্তিদের দেশ স্বাধীন হলে চাল সস্তা হবে। সলেমান খাঁর কথা প্রসঙ্গে বলে উঠেন-

> "সাদীন যে অইল হের কোন নমুনাই পাইলাম না আইজও। দিন দিন যে খারাপের দিগেই চলল।"[৬]

সলেমানের ভাই লোকমানের বক্তব্য প্রায় কাছা কাছি–

> "কত আশা ভরসা আছিল। সাদীন অইলে ভাত কাপড় সাইয্য অইব।খাজনা মুকুব অইব।"[৭]

এই আশা নিরাশা জয়গুণ কিংবা সলেমান বা লোকমানের মতো একক ব্যক্তির নয় সমগ্র বাংলাদেশের সেই প্রান্তিক, মেহেনতি, খেটে খাওয়া মানুষের স্বর।আর যারা প্রতাপ তারাতো চিরকাল ক্ষমতার অলিন্দে কিভাবে টিকে থাকতে হয় সেই কৌশল একই থেকে গেছে। শুধু সময় আর প্রেক্ষিতে তাদের শাসন ও শোষণের পথ আলাদা হয়েছে। তার প্রমাণ গদু প্রধান, ফুড সেক্রেটরি খুরশিদ কিংবা রশিদ কন্ট্রাক্টর এর মতো ব্যক্তিরা। আর সেই দৃশ্যর বাস্তবরূপ অঙ্কিত করেছেন কথাকার আবু ইসহাক।

সূর্য দীঘল বাড়ি উপন্যাসে একদিকে যেমন রয়েছে ইতিহাস অন্যদিকে রূপকথা। ইতিহাস ও রূপকথার অন্তরালে রয়েছে গ্রামীণ সভ্যতার, সংস্কৃতি ও সেই জনপদ জীবনের প্রান্তিক স্বর। শহর কেন্দ্রিক সভ্যতায় আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে। গ্রামীণক্ষেত্রে রয়েছে, তাবিজ, কবজ, ঝাড়-ফুক, তন্ত্র-মন্ত্র। তাই ফকিরের কাজে কিছুটা হলেও তার আধুনিক মনন মেনে নিতে পারেনি। এই দুইয়ের পার্থক্য জয়গুণ বোঝে। যেহেতু জয়গুণ জব্বার মুন্সীর সাথে বেশ কিছু দিন শহর কেন্দ্রিক জীবন কাটিয়েছে। তাই তার দৃষ্টিকোণ আধুনিকতাকে এড়িয়ে যায়নি। সেই প্রমাণ উপন্যাসের পরিসরে উপন্যাসিক দিয়েছেন। ইসলাম ধর্মের বেশ কিছু নিয়মের বাইরে গিয়ে সংসার ও সন্তানের দায়িত্ব পালন করার জন্য বেপর্দা হয়ে পুরুষের মধ্যে নিজেকে সমতুল্য করে তুলেছেন। গদুপ্রধান কিংবা মৌলোভীর নির্দেশকে তোয়াক্কা না করেই বাড়ীর বাইরে বেরিয়েছেন। কিংবা অল্প বয়সে মায়মুনের বিয়ে দিতে আগ্রহী নয় বা কাসুর চিকিৎসা ব্যবস্থায় আধুনিক মননে ডাক্তার পরামর্শ। অর্থাৎ এ উপন্যাসে আবু ইসহাক সমাজ ব্যবস্থার প্রতি, নির্মম অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন এবং সামাজিক প্রথার শেকল ভেঙে ধর্মের ঊর্ধ্বে মানবতার দিকগুলির আখ্যানের মধ্যদিয়ে বিনির্মাণ করেছেন।

'সূর্য দীঘল বাড়ী' উপন্যাসটি শুধু উপন্যাসিকের লিখনে জীবন-যুদ্ধের আখ্যানের ঊর্ধ্বেও যে প্রথাগত ঐতিহ্য বা সংস্কৃতি ছিল, সেই দিকটিও উল্লেখ করতে ভুলেননি। তাই এই উপন্যাসে মন্বন্তর কিংবা দেশভাগের আখ্যান হলেও, যেমন রূপকথা বা লোকবিশ্বাস এর দিকটিও আলেখ্য লেখনী সৃজনে ধরা পড়েছে। হাদেম ও খাদেম নামক দুই ভাইয়ের সেই ভিটে মাটি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার সেই ইঙ্গিত বহন করে। এই লোকবিশ্বাসের অন্তরালে গদু প্রধান নামক ব্যক্তির সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্ষমতা প্রদর্শনই আসলে উঠে আসে। ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী 'লোকসাহিত্য' প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করেছেন–

> "আদিম মানুষ যা যা ভয় করত, আধুনিক মানুষ হয়ত তার সবটাকে ভয় করে না। ভয়ের পাত্র বদলে গেছে, ভয় কিন্তু রয়ে গেছে। ভক্তি, ঘৃণা, ভালোবাসা, বিশ্বাস প্রভৃতি মনের ভাবগুলি সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।"[৮]

আধুনিক ব্যক্তিমননের বদল হাদেম ও খাদেম দুই ভাই না পারলেও সফির মা, জয়গুণ তা করে দেখিয়েছে। এক্ষেত্রে উপন্যাসিক পুরুষ তান্ত্রিক সমাজের আধিপত্যবলয় ভেঙে জয়গুণ এর মত নারী চরিত্র সৃষ্টি করে সমকালীন সমাজেই শুধু নয়, আধুনিক সমাজেও সেই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার ইঙ্গিত এই 'সূর্য দীঘল বাড়ী' নামক উপন্যাস।

উপন্যাসিক এ উপন্যাসে দেশভাগের আড়ালে বা স্বাধীনতার নামে এক শ্রেণীর ভণ্ড বা শোষণকারীর মুখোশ খুলে দিয়েছেন। যারা ধর্মের নামে বেসাতি করে কিংবা মুখোশের আড়ালে নিজেকে মোড়ল বা বিবেকবান বলে প্রতিষ্ঠা পান। সে ফকির হোক বা গদু প্রধান কিংবা খুরসিদ মোল্লা বা রাসিদের মত ব্যক্তিবর্গ। এরা প্রত্যেকেই শোষণ করেছে সেই, মাটির মানুষকে। কখনো বিনা পারিশ্রমিকে বেগার খাটিয়ে হাসুর মত একটি শিশুকে রাশিদ সাহেব যথাযথ পাওনা না মিটিয়ে অপমানজনক ভাবে শরীর মালিশ করিয়েছে। এবং তাকে সারারাত ফুটপাতে মশার কামড়ে রাত কাটাতে হয়। কখনো বা রেশনের নামে লাইনে দাড় করিয়ে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেও তাদের বিবেককে দংশন করেনি। কখনো বা বাস্তুভিটা মন্ত্রের নামে বেঁধে দেওয়ার টোটকা। বিনিময়ে পিতলের বাসনপত্র বা টাকা পয়সা নেওয়ার নতুন নতুন ফন্দি ফিকির কৌশল বার করেছে, এই মুখোশধারীরা। বরঞ্চ এ তাদের উল্লাস বা আনন্দের উপহার।

'সূর্য দীঘল বাড়ী' উপন্যাসের আখ্যানের অন্যতম দৃষ্টি আকর্ষণকারী চরিত্র হল জয়গুণের কন্যা মায়মুন। অল্প বয়স থেকেই মায়ের অনুপস্থিতিতে সংসারে যাবতীয় দ্বায়িত্বকর্ম নিজের হাতে তুলে নিয়েছে।তাই তার মায়ের মতে বয়স দশ হলেও মেয়ে মায়মুনকে সাত বছরের মনে হয়। ঔপন্যাসিকের লেখনীতে ফুটে উঠেছে; রোগা পাতলা ছিপছিপে হাড় ক্ষয় শরীর মায়মুনের। তাই মেয়েকে নিয়ে চিন্তিত জয়গুণ। সফীর মা উদ্যোগের সাথে মায়মুনের বিয়ে দিতে আগ্রহী বিবিহারা ওসমানের সাথে। কিন্তু জয়গুণ এই বিয়েতে প্রথমে সম্মতি দেননি। কারণ এই অল্প বয়সে বিয়ে দিলে শারীরিকভাবে মেয়ের ক্ষতি হবে কিন্তু সামাজিক চাপ ও অর্থনৈতিক অভাবের তাড়নায় মায়মুনকে ওসমানের সাথে বিয়ে দিতে সম্মত হন। তাই জয়গুণ সামাজিক বয়কটের ভয়ে, সামাজিক বিধি মেনেই মেয়ের বিয়ে দিলেন। কিন্তু ওসমানের পরিবার যে মেয়ে নয় কাজের দাসী আনবেন সেই বক্তব্যই ধরা পড়েছে ওসমানের পিতা সোলেমানের বাচনে- "দুই মাসের মইদ্যেই দ্যাখবা বউ আমাগ লায়েক অইছে।"[৯] মায়মুন শাশুড়ি জরিনা বিবির অত্যাচার সহ্য করতে একপ্রকার অভ্যস্ত হয়েই গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার শাশুড়ি তাকে সেই তাল গাছের নিশানায় অর্থাৎ সেই সূর্য দীঘল বাড়ীতেই একপ্রকার ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। যে অল্প বয়সের মেয়ে তার এক প্রকার খেলার বয়স যে এখনো মায়ের আঁচল ছাড়তে পারেনি, বাল্য বিবাহ দিলে কি ভয়ঙ্করতম ক্ষতি হতে পারে, সেই দৃশ্য তুলে ধরতে ভুলেননি কথাকার আবু ইসহাক। বিশেষ করে ইসলামিক সমাজেও যে অল্প বয়সে বিয়ে সামাজিক অভিশাপ হতে পারে সেই চিত্র মায়মুনের মধ্য দিয়ে অঙ্কিত করেছেন।

হাসু চরিত্রটিও উপন্যাসের কেন্দ্রীয় পটভূমির অন্যতম। উপন্যাসিক এই চরিত্র সৃষ্টি করে সামাজিক পরিসরে এক বিপ্লব ঘটিয়েছেন। মায়ের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সাংসারিক দ্বায়িত্ব পালনে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছে। হাসুর মধ্যে একদিকে মাতৃপ্রেম অন্যদিকে ভাই ও বোনের প্রতি স্নেহ লক্ষ্য করা যায়। জীবন ও যুদ্ধের সংগ্রামে প্রাণের বাজি রেখে ভরা গাঙে ঝাঁপ দিয়ে লঞ্চে ওঠে, মোট বহন করার কাজে যুক্ত হয়, কিন্ত নম্বরহীন হওয়ায় তাকে অন্যান্য শ্রমিকের হাতে আঘাতপ্রাপ্ত হতে হয়। তা স্বত্বেও সে সংসারে দুমুঠো

অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য সে এ ধরনের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। সে চায় সৎ পথে উপার্জন করে বাঁচতে। কিন্তু খুরসিদ মোল্লার মত ব্যক্তিরা বিনা পয়সায় পরিশ্রম করিয়ে উপযুক্ত মূল্য না দিয়ে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়ার নতুন নতুন কৌশল খোঁজে। সেই চিত্র যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি হাসুর সৎ ও নিষ্ঠাবান দ্বায়িত্বর দিকও লক্ষ্য করা যায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যেমন গাছের উপর আসমানি পতাকা অর্থাৎ পাক পতাকা লাগানোর দৃশ্য, তেমনি ভাই কাসুর প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা, এমনকি বোন মায়মুনের বিয়ের বাজার থেকে, কাসুর চিকিৎসার জন্য বাড়ীতে ডাক্তার আনার ব্যবস্থা সবই দৃশ্য এ উপন্যাসের আখ্যানভাগে ফুটিয়ে তুলেছেন উপন্যাসিক।

হাসু চরিত্রর পাশাপাশি এ উপন্যাসে সফী চরিত্রটিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সফী চরিত্র ছাড়া হাসুর অস্তিত্ব অসম্পূর্ণ। তাই ক্ষেত্র বিশেষে সফী, হাসুর এগিয়ে যাওয়ার দিকই ইঙ্গিত করে।

এ উপন্যাসে দেশভাগ প্রেক্ষিত, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, আকাল, মন্বন্তর মহামারীর করালরূপ ছাড়াও উপন্যাসিক আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি জোর দিয়েছেন। তাইতো উপন্যাসিক দেখালেন প্রাচীন কবিরাজ প্রথা, ঝাড়-ফুক, তাবিজ-কবজ, যে কত ভয়ঙ্কর রূপে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থাকে গিলে ফেলেছে, সেই প্রথাকে বাদ দিয়ে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান দ্বারা মানুষকে সুস্থ করা যায় তার সেই দিকটাই জয়গুণ দ্বারা ডাক্তারের আগমনকেই ইঙ্গিত করে। কাসু অসুস্থ হওয়ার ফলে করিম বকশ প্রথমে ফকির দ্বারা ঝাড়ফুকের ব্যবস্থা করেন কিন্তু এতে কাসুর শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখা দেয়।এই সংবাদ জয়গুণের নিকট পৌঁছতেই সে প্রাচীন প্রথার বিরুদ্ধে একপ্রকার বিপ্লব করে নিজস্ব ব্যক্তিত্বেরবলে এলপ্যাথিক ডাক্তার আনার ব্যবস্থা করেন এবং সেই ব্যক্তিত্বে সফলও হোন।ধীরে ধীরে কাসু সুস্থ হয়ে ওঠে।নিউমেনিয়া রোগে আক্রান্ত কাসু একথা জানতেই ডাক্তার বলে ওঠেন–

> "দেশের শাসন ক্ষমতা আমার হাতে থাকলে ব্যাটাদের ফক্করবাজি দেখিয়ে ছাড়তাম।ফাঁসি দিতাম ব্যাটাদের। এ নরহত্যা ছাড়া কিছু নয়।"[১০]

এখানে উপন্যাসিক অন্ধকারময় জগত থেকে আলোর দিকে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছেন সময়ের সাথে সাথে। অন্ধবিস্বাস ও কুসংস্কার যে সামাজিক অভিশাপ সেই দৃশ্যই এই উপন্যাসে নতুন করে দেখা দিল।

এ উপন্যাসের আখ্যানভাগে পুরুষতান্ত্রিকতার আধিপত্যতাবিধি বা লিখনবানী যাদের হাতে সেই দিকগুলিও উল্লেখ করতে ভুলেননি উপন্যাসিক। তাদের মধ্য উল্লেখ্য রহমত কাজী যার দ্বারা পরিচিতি ঘটছে সূর্য দীঘল বাড়ী নামক বাস্তুভিটার। রহমত কাজী স্বয়ং জানিয়েছেন-

> "সূর্য দীঘল বাড়ীর গাব গাছের টিকিতে চুল ছেড়ে দিয়ে একটি বউ দুপা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।"[১১]

অর্থাৎ এবাচনই মনে করিয়ে দিচ্ছে আর যেন কেউ সেই ভিটের দিকে ফিরে না তাকায়। এই ধরনের কুসংস্কার ঘেরাটোপ বন্দীতে ঐ ভিটাতে যেন কেউ প্রবেশ করতে না পারে, এই মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এসেছে গদুর মতো ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা। যার অঙ্গুলি হেলনেই সমাজের ব্যবস্থা চলে। আর উপন্যাসের আখ্যানেও সেই দৃশ্যই বার বার ফুটে উঠেছে। এই বাস্তুভিটায় একরাশ আশা নিয়ে ঘর বাঁধার জন্য গ্রামে ফিরেছে জয়গুণ ও সফীর মা। কিন্তু নিজস্ব ব্যক্তিত্বের জোরেই জয়গুণরা সেই ভিটেতে থাকার ব্যবস্থা করে। কিন্তু উপন্যাসের শেষে করিম বকশের মৃত্যুই সেই বাস্তুভিটার অলৌকিক রহস্য প্রকাশ করে।

শুধু তাই নয়, এ উপন্যাসের আখ্যান জানান দেয় পিতৃতন্ত্র প্রতাপ কিভাবে নিজেদের বশ্যতায় নারীদের পণ্য মনে করে সেই দিকও উল্লেখিত। ফকির, গদু প্রধান, করিম বকশ, সোলেমান, ওসমান, খুরশিদ মোল্লা তার দৃষ্টান্ত। ফকির জবেদ আলীর কাজ ঝাড়ফুক, তাবিজ কবজ এর মাধ্যমে নিজের অন্নসংস্থান করা। জয়গুণদের

বাস্তুভিটেতে থাকার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে তার নজর পড়েছে।তাই সে গোপনে তার কামনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে জয়গুণের শরীরে। গদু প্রধানও জয়গুণের একাকিত্বের সুযোগ কাজে লাগাতে চেয়েছে। কিন্তু জয়গুণের ব্যক্তিত্বের নিকট এরা প্রত্যেকেই বিফল হয়েছে। করিম বকশের নিকটতো নারী ভোগ্য হয়ে উঠেছে। এক স্ত্রীর মৃত্যুর পর আরেক বিয়ে তার যৌন লালসার ইঙ্গিতই বহন করে। সোলেমান এর মত ব্যক্তির নিকটও নারী হচ্ছে ভোগ্য দাসী। ওসমানের প্রথম স্ত্রীর বিয়োগের পর দ্বিতীয় বিয়ে এবং সেই মায়মুনকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যেন তার কাছে উৎসব বা আনন্দের মত। খুরসিদ মোল্লার কোলকাতায় থাকাকালীন তার শরীর মালিশ যেন সেই যৌনতার ইঙ্গিত দেয়। অর্থাৎ এরাই সেই সমাজের আধিপত্যতা কায়েম করে রেখেছে। আর সেই সমাজের সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন জয়গুণ। তাই এই প্রতাপরাই আবার ধর্মের দোহাই দিয়ে জয়গুণকে আটকানোর ব্যবস্থাও করেছেন।

জরিনা বিবিকে এ উপন্যাসে একটি পুতুল চরিত্র বললেও হয়ত ভুল হবেনা। জরিনা বিবিকে নিয়ন্ত্রন করেছে সোলেমান এর মত ব্যক্তিরা। তানাহলে মায়মুনের মত একটি অল্প বয়সের ফুটফুটে মেয়েকে বাড়ী থেকে বের করে দিতে একটুও দ্বিধা করেনি। নারী হয়ে নারীর আর্তনাদ বুঝেনি। বুঝেনি সে নারীর যন্ত্রণা, দুঃখ কষ্ট। উপন্যাসিক একদিকে জয়গুণের মত প্রতিবাদী নারী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন; তেমনি অপরদিকে পুরুষতন্ত্র বলয়ে নারী কিভাবে নিজেকে সেই জালে জরিয়ে নিজেই যন্ত্রে রূপান্তরিত হচ্ছেন সেই চিত্র।

উপন্যাসিক আবু ইসহাক এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন; প্রাচীন প্রথা কিভাবে আধুনিক মনন ভাবনাকে ক্ষমতার অলিন্দে থাকা ব্যক্তিরা নিজস্ব কৌশল দ্বারা পরিচালনা করে অন্ধকার জগতে ঠেলে দেয় সেই দৃশ্য। আবার সেই প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে ধর্মের নামে ভয় দেখিয়ে কিভাবে সামাজিক বয়কট করে একঘরে করে দেওয়া হয় সেই দৃশ্যও। তাইতো উপন্যাসিক প্রথমেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন শহর থেকে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ। জয়গুণ শহর অর্থাৎ আধুনিকতার ছোঁয়া যে পেয়েছিলেন তা উপন্যাসের আখ্যানে স্পষ্ট। তাই সে আলোর জগত থেকে ফিরে সেই বাস্তুভিটেতে অর্থাৎ সূর্য দীঘল বাড়ীতেই নয় গ্রামের মধ্যে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সমাজের মাতব্বরা সেই পথের বাধা হয়ে ,ভুত প্রেত নামক ছায়া অশরীরী আত্মার খেলায় মেতে উঠলেন।আর এই অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একা নারী হয়ে সেই লড়াইয়ে সামিল হোন। একদিকে দারিদ্রতার লড়াই অপরদিকে আত্মসম্মানের লড়াই এই দুই সংগ্রাম তাকে নানান সময় পিছুটান করলেও লক্ষ্যে কিন্তু অবিচল ছিলেন। অবশেষে তার চিন্তা ও চেতনার সাফল্য এসছিল। অর্থাৎ আলো থেকে বৃহত্তর জগতে উজ্জ্বল আনার লক্ষ্যেই এই উপন্যাসের আখ্যানভাগ নির্মিত।

সুতরাং দেশভাগ প্রেক্ষিত ও দ্বিতীয়বিশ্বযুদ্ধ,সাম্প্রদায়িকদাঙ্গা এবং আকাল, মহামারীর পরিসরে সূর্য দীঘল বাড়ী একটি উপন্যাসই শুধু নয়, ধর্মের ঊর্ধ্বে মানবতার অস্তিত্বের সংগ্রাম এবং প্রান্তিক শ্রেণীর চিহ্নায়কও বটে। উপন্যাসিক এ উপন্যাসে অবলা থেকে সবলা কিভাবে হতে হয় সেই দিকগুলি তুলে ধরেছেন যেমন, তেমনি তার আত্মসম্মানের লড়াই কিভাবে সামাজিক পরিসরে টিকিয়ে রাখতে হয় সেই দিকগুলোও দেখিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

১. ইসহাক, আবু। সূর্য দীঘল বাড়ি। ঢাকা, বাংলাদেশ প্রথম সংস্করণ (১৯৫৫), চিরায়ত প্রকাশন, প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

২. তদেব, পৃ. ৯২২।

৩. তদেব, পৃ. ২৩। তদেব, পৃ. ৮৫। তদেব, পৃ. ৮৬। তদেব, পৃ. ১০৪। তদেব, পৃ. ১১৬।

৪. তদেব, পৃ. ১১।
৫. রায়, দেবেশ। উপন্যাস নিয়ে। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৩।
৬. চক্রবর্তী, সুধীর (সম্পাদক)। বুদ্ধিজীবীর নোটবই। পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ , ২০০৫।
৭. সিদ্দিকী, আশরাফ। লোকসাহিত্য। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৭।
৮. তদেব, প্রথম খন্ড, পৃ. ১৪।
৯. আলম, খুরশিদ। সমাজ গবেষণা পদ্ধতি। কবির পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ, ২০১২।
১০. ভট্টাচার্য, তপোধীর। প্রতীচ্যের সাহিত্য তত্ত্ব। অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা বইমেলা, ২০০২।
১১. ভট্টাচার্য, তপোধীর। বাখতিন তত্ত্ব ও প্রয়োগ। পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৬।